Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 51-62
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথক নৃত্যের ইতিহাস

দীপা সরকার
গবেষক, নৃত্য বিভাগ, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

In Present, Kathak is one of the finest forms of classical dance and also the most popular dance in the world. The word "Kathak" is comes out from the vedic Sanskrit word "Katha" which means the story and the word "Kathakatha" that take places in various Hindu epics and text which reveals the person who is telling a story. Kathak is the only dance which is the combination of Hindu mythology and Islamic culture. But nobody knows when and where it has been started as well as the root of Kathak dance. In respect of India, Kathak is a primitive classical dance form which is probably originated in Lucknow and after that it has spread its wings in Jaipur, Banaras or Varanasi and several places. After partition of India in the year of 1947, Kathak has been took places in East-Bengal (before liberalization Bangladesh is known as East-Bengal) through various renowned Guru. In the present paper we have discussed the history of kathak dance in respect of India and Bangladesh.

Keywords: Kathak, India, Bangladesh.

ভূমিকা : বর্তমান কালের সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় নৃত্যধারা হলো কথক নৃত্য। কথক নৃত্থ্যের উৎপত্তি কবে বা কোথায় হয়েছিল তা সঠিক ভাবে বলা যায় না, কারণ এ ব্যাপারে নানা কিংবদন্তীর প্রচলিত মতবাদ রয়েছে। কথক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গ্রন্থিক বা গাথাকার। কথা যে কয় সে হল কথক এবং তারই কলা বিদ্যার নাম কথক। বলা বাহুল্য এখানে 'কথা' শব্দটির অর্থ 'বাক্য' বা 'বাণী' নয়। এই প্রসঙ্গে কথা 'গল্প', 'কাহিনি' ও উপাখ্যান' এর প্রতিশব্দ। বৈদিক কালে প্রচলিত নৃত্যশৈলীও কথক নৃত্যের অনুরূপ ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতীয় সমাজের বাচকেরাই মহাকাব্যের বিবিধ প্রসঙ্গকে বাচন কলার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতেন। তখন তাদের কথিক বা চারণ বলা হতো। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কথক' বা 'কথাকার', পালি সাহিত্যে 'কথিকা' এবং জৈন ধর্মগ্রন্থে 'কুহুক' দের উল্লেখ আমরা পাই। এদের সম্বন্ধে বলা হয় যে, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন লোকালয়ে ঘুরেঘুরে নাচ-গান-অভিনয়ের মাধ্যমে পুরানের গাঁথা জনসমাজের সম্যক্ষে তুলে ধরতেন। মন্দিরে, রাজ-সভায়, তপোবনে, নগরে, গ্রামে সব জায়গাতেই এই সম্প্রদায়ের যাতায়াত ছিল। কথক নৃত্যের উৎপত্তি কবে ও কোথায় হয়েছিল সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রচলিত মতে কথক নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রীয় নৃত্যের মত কথক নৃত্যের জন্ম হয় মন্দিরে। পরবর্তী সময়ে এই মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে ভ্রাম্যমান ভাবে জীবন যাপন করতে থাকে এই সব নৃত্য শিল্পীরা। আবার বৈষ্ণব সাহিত্যে নটবরী নৃত্যের বর্ণনা আমারা দেখতে পাই। ধারণা করা হয় যে, ভগবান কৃষ্ণই বৃন্দাবনে এই নৃত্যধারা শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন গৎ, ভাবাভিনয়, ফেরি, পাল্টা ইত্যাদির সূত্রপাত হয় সেই বৃন্দাবনে এবং রাসধারীদের নৃত্য গীতের মধ্যে পূর্বাভাস পাওয়া যায় বর্তমান কথক নৃত্যের। পূর্বে কীর্ত্তন এর বিভিন্ন পদে এবং রসের মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ নৃত্য পরিবেশিত হত যা

পরবর্তীতে শাস্ত্রীয় কথক নৃত্যের 'নৃত্ত' পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়। মোগল যুগে কথক নৃত্যের আমূল পরিবর্তন আসে। পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক রূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে দেবতাদের আরাধনার পরিবর্তে। তবে বর্তমানের যে পরিশুদ্ধ কথক নৃত্য পরিলক্ষিত হয় তা পরিমার্জিত হয়ে ওঠে সেই মোগলযুগে বিভিন্ন নবাবদের দরবারে। তখন নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় কথক নৃত্য শিল্পীরা এই নৃত্য চর্চা করতেন। কথক নৃত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয় নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ এর রাজত্বকালীন সময় কে। নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্ ছিলেন একজন সংগীত পিপাসু সফল কবি ও নর্তক। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগের পর পূর্ব বাংলায় (যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত) নৃত্য বিভিন্ন গুরুদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তা শাস্ত্রীয় নৃত্য যেমন কথক, মণিপুরী, ভরতনাট্যম, ওডিসী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে প্রসারিত হয়েছিল। সর্বপরি বলা যায় যে, কথক নৃত্যে হিন্দু পুরান ও ইসলামিক রীতিনীতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন দেখতে পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা ভারত ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথক নৃত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

পূর্বের আলোচনা : ড. অভিজিৎ রায় (১৪১৩) কথক নৃত্য ও কথকতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। লেখক এই দুয়ের দায়বদ্ধতা বা পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচলার মাধ্যমে কথকনৃত্য ও কথকতা কার্যধারার মধ্যে কোন যোগসূত্র আছে কিনা তার অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। কথকনৃত্যের উৎস প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ যেমন : কথকতা থেকে কথক নৃত্যের রূপলাভ, মুসলিম দরবার থেকে কথক নৃত্যের উৎপত্তি - এই দুই মতবাদই যে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত নয় তা যুক্তির সাহায্যে আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন লেখক। কোনরূপ কাল্পনিক বা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী না হয়ে, ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে কথক নৃত্য রূপলাভের প্রধান উৎস কোথায় ও কোন নৃত্য পরিমার্জিত হয়ে বা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীয় কথক নৃত্যে রূপান্তরিত হয়েছে, তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে লেখক ব্যাখ্যা করেছিলেন। এছাড়া লেখক কথক নৃত্যের বিভিন্ন ঘরানা ও কথক নৃত্য প্রয়োগের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

রাহমান (১৯৮৪) বুলবুল চৌধুরীর জীবন-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। ১৯৪৭-এ ভারতবর্ষের ভাগের পর পূর্ব বাংলায় নৃত্যকলা প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য বুলবুল চৌধুরীর অবদানের কথা যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এমনকি শাস্ত্রীয় নৃত্য যেমন— কথক, ভরতনাট্যম, কথাকলি ও মণিপুরী প্রভৃতি নৃত্যের প্রসারের ক্ষেত্রে বুলবুল চৌধুরীর অবদানের কথা বর্ণনা করেছেন।

চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৯) কথক নৃত্যের উৎপত্তি ও প্রসারণের কথা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। লেখিকা উল্লেখ করেছিলেন যে, কথক নৃত্যধারা মূলত ধর্মমূলক ও বিভিন্ন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই এই নৃত্য প্রথমে প্রসার লাভ করেছিল। লেখিকা আরো বলেছিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারে কথকনৃত্য যে নতুন রূপ লাভ করেছিল তাই বর্তমানে শুদ্ধরূপ হিসাবে গণ্য করা হয়। মুসলমান আমলে মন্দির থেকে দরবারে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই কথক নৃত্যের যে গুণগত ও চারিত্রিকগত পরিবর্তন সূচিত হয় তা লেখিকা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ভাবে বর্ণনা করেছিলেন। লেখিকা আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, মুসলমান আমলেই কথক নৃত্য ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক শুদ্ধ ধারা থেকে বিচ্যুতি হয়ে নিছক ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও যৌন আবেদনে পর্যবসিত হয়েছিল এবং নাচওয়ালী পেশাদারী গণিক শিল্পীতে পরিণত হয়েছিল। তার সাথে লেখিকা আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্র আমলেই কথক নৃত্যের সবচেয়ে বেশি উন্নতি ও প্রসার হয়। পরিশেষে লেখিকা কথক নৃত্য পদ্ধতির বিভিন্ন ঘরানা ও এইসব ঘরানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন।

ঘোষ (২০১১) কথক নৃত্যের প্রাচীনতা, ঐতিহাসিকতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া লেখিকা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে কথকনৃত্যের উপর ভাস্কর্য ও শৈল্পিক প্রভাব, পুরানাদির প্রতিচ্ছবি ও কলাকৌশলগত পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই নৃত্যের পরিবর্তিত রূপ সম্বন্ধে লেখকের মতামত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত কথক নৃত্যকলা কৌশলগত পদ্ধতিতে যে শুদ্ধতা ছিল তা লেখিকা যুক্তিযুক্তভাবে আলোচনা করেছিলেন। লেখিকা কথক নৃত্য পদ্ধতির বিভিন্ন ঘরানা যেমন : লক্ষ্ণৌ ঘরানা, জয়পুরে ঘরানা ও বেনারস ঘরানা সম্বন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং প্রতিটি ঘরানা

প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন।

চক্রবর্তী (২০১১) কথক নৃত্যের উদ্ভব, বিকাশ ও পরম্পরা সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন। লেখিকা বলেছিলেন যে, উত্তর-প্রদেশের রাসমণ্ডলির রাসধারী পরম্পরা থেকে কথক নৃত্য বিকশিত হয়েছিল এবং এই নৃত্যের অভিনয় অংশে কৃষ্ণের সাথে গোপীদের আধ্যাত্মিক মিলনের কাহিনি পরিলক্ষিত হয়েছিল বলে একে নটবরী নৃত্য বলে। লেখিকা আরো উল্লেখ করেছিলেন যে, মোগল যুগে কথক নৃত্য তার পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক রূপ থেকে বিচ্যুত হয়ে দেবতাদের আরাধনার পরিবর্তে রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়া লেখিকা কথক নৃত্য পদ্ধতির বিভিন্ন ঘরানা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলেন এবং এই সব ঘরানা প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরু ও রাজাদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। পরিশেষে লেখিকা কথকনৃত্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যেমন: কথক নৃত্য তালাশ্রয়ী ও এই নৃত্য শিল্পীদের তাদের নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য স্বাধীনতাযুক্ত নৃত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত বর্ণনা করেছিলেন।

ড. অভিজিত রায় (১৪১৬-বাংলা) কথক নৃত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পিছনে ধর্ম ও সংস্কৃতির ভূমিকার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। শৈব ধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে কথক নৃত্যের আন্তরিক সম্পর্কের দিক তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া রাস, রাসলীলা, নৃত্যনাট্য, শ্রীরাধা, গীত গোবিন্দ ইত্যাদির সঙ্গে কথক নৃত্যের যোগসূত্রের বিষয়টা লেখক বিশদভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। তার সাথে লেখক কথক নৃত্য উদ্ভবের পিছনে মুসলিম দরবার ও ইসলাম সংস্কৃতির অবদানের প্রেক্ষাপটে তার সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। নৃত্যের কার্যকর ভূমিকা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুফিদের মতামত এবং দরবেশ কর্তৃক পরিবেশিত অতীন্দ্রিয় নৃত্য সাধন পদ্ধতির প্রয়োগকৌশল ও উদ্দেশ্যের কার্যকর ভূমিকার বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পরিশেষে লেখক কথকনৃত্য ও দরবেশ কর্তৃক পরিবেশিত অতীন্দ্রিয়তাবাদী নৃত্য সাধন পদ্ধতির মধ্যে যে সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য উপস্থিত তার তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেছিলেন।

অধিকারী (২০১৪) কথক নৃত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। লেখক উল্লেখ করেছিলেন যে, প্রাচীনকালে যারা ভাবাভিনয়, গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে দেব-দেবীর লীলা কীর্ত্তন করতেন, পৌরাণিক গাঁথা ও উপাখ্যান পাঠ করতেন তারা কথক সম্প্রদায় নামে পরিচিত ছিলেন। লেখক আরো বলেছিলেন যে, কথকনৃত্য মুখ্যতঃ শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্যের প্রকাশ বলে একে কথক নটবরী নৃত্য নামে অভিহিত করা হত। মোগল যুগের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র আমলেই যে কথক নৃত্যের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার হয়েছিল তা লেখক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। কথক নৃত্য প্রসারণের ক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের যে প্রভাব রয়েছে তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তিদিয়ে আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া লেখক কথক নৃত্য পদ্ধতির বিভিন্ন ঘরানা যেমন: লক্ষ্ণৌ ঘরানা, জয়পুর ঘরানা ও বেনারস ঘরানা এবং প্রতিটি ঘরানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুদের অবদানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। লেখক পরিশেষে কথক নৃত্য প্রদর্শনের রীতি ও কথক কবিত্ত্ব ও ঠুমরীর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলেন।

সিকদার, সিকদার ও সিনহা (সিকদার) (২০০৪) কথক নৃত্যের অঙ্গ, অঁদা, অঙ্গহার প্রভৃতি থেকে শুরু করে অভিনয় আন্দাজ, ইষ্ট পথ, কথক নৃত্যের অবয়ব, তাল, পাদবিন্যাস, হস্তক ও হস্তমুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ভাবে আলোচনা করেছিলেন। এছাড়া লেখকবৃন্দ অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে কথকনৃত্যের বিস্তৃত ইতিহাস বা কথক নটবরী নৃত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, কথক নৃত্যের আদি হইতে বর্তমান কাল অবধি বেশ ভূষার বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ, কথক নৃত্যের উন্নতিকল্পে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌র অবদান সম্বন্ধে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। সবশেষে লেখক বৃন্দ কথক নৃত্যে প্রযোজ্য হস্তমুদ্রা, কথকনৃত্যের ঘরানা, কথক নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এবং কথক নৃত্যে কবিত্ত্ব ও ঠুমরীর মহত্ত্ব ও ইহা প্রস্তুত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেছিলেন।

ঘোষ ও ঘোষ (২০১৫) বলেছিলেন যে, প্রাচীনকালে গ্রন্থিক বা গাথাকাররা জনসাধারণের মধ্যে দেবমাহাত্ম্য, দেবলীলা ও পৌরাণিক কাহিনি সমৃদ্ধ যে নৃত্য প্রদর্শন করতেন তাই কথক নৃত্য। লেখকবৃন্দ উল্লেখ করেছিলেন যে, কথক নৃত্য মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দির থেকে দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সাথে বিশেষ এক শ্রেণির পেশাদার নর্তকী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল যারা দরবারে আমীর ওমারাহ্‌দের তৃপ্তির জন্য কথক নৃত্যের শাস্ত্রীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দেহসর্বস্ব মনোরঞ্জক চটুল নৃত্য পরিবেশন করতেন। আবার কথকনৃত্যের সামগ্রিক প্রচার ও

প্রসারের ক্ষেত্রে নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র অবদানের কথা অত্যন্ত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছিলেন। এছাড়া লেখকবৃন্দ কথক নৃত্য শৈলীর বিভিন্ন ঘরানা এবং এইসব ঘরানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজা, মহারাজা ও গুরুদের অবদানের কথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবে বর্ণনা করেছিলেন। পরিশেষে লেখকদ্বয় কথক নৃত্যের সপ্ত অবয়ব যেমন : ঠাট, নৃত্যাঙ্গ, জাতিশূণ্য, ভাবরঙ্গ, ইষ্টপদ, গতিভাব ও তারানা সম্বন্ধে তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

ভারতবর্ষে কথক নৃত্যের ইতিহাস : ভারতবর্ষে কথক নৃত্যের ইতিহাস সুদূর প্রসারী। ভারতবর্ষের লোক সাহিত্যে কথকতার অবদান উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনযুগে যারা গীত ও নৃত্যের সাহায্যে দেব-দেবীদের লীলা কীর্ত্তন করতেন এবং বিভিন্ন উপাখ্যান পাঠ করতেন তারা কথক সম্প্রদায় নামে অভিহিত হতেন। তারা পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতেন। তাই অনেকের ধারণা এই কথক সম্প্রদায় থেকেই 'কথক' নৃত্যের উৎপত্তি হয়েছে। আবার অনেকেই মনে করেন কথা বা বোল বলিয়া নৃত্য করা হত বলে এই নামকরণ করা হয়েছে। এই কথক সম্প্রদায় বিভিন্ন কাহিনিকে কথা ও বিভিন্ন অঙ্গ ভঙ্গি বা নৃত্যের মাধ্যমে সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করতেন। এই নৃত্যের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য প্রকাশ হত বলে অনেকেই একে "কথক নটবরী" নৃত্য নামে অভিহিত করতেন। মহাভারত, পালি-শব্দকোষ ইত্যাদি গ্রন্থে "কথক" শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্ম পুরাণেও গায়ক, নর্তক এবং অভিনেতা বুঝাতে "কথক" শব্দটি ব্যবহার করা হত। "আবার কারও কারও মতে এলাহাবাদের হুন্ডিয়া তহশীল গ্রামের কথক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রদর্শিত 'অরখা' নৃত্যই কথক নৃত্য নামে পরিচিত হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের সংখ্যাধিক্য ছিল। এদের মধ্য থেকে বিশেষ একটি শ্রেণি জীবিকা অর্জনের জন্য প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা নৃত্যগীতের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করে প্রভুত অর্থ ও যশ অর্জন করতেন। কালক্রমে এদের নৃত্যপদ্ধতি ক্রমে একটি বিশেষ রূপে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং যুগভেদে রুচির পরিবর্তনে ও সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে নানা প্রকার ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে বর্তমান কথক নৃত্যের সৃষ্টি হয়" (ঘোষ, ২০১৫)। কালক্রমে এই কথক নৃত্য গ্রাম থেকে মন্দির, মন্দির থেকে রাজ দরবার এবং রাজ দরবার থেকে বর্তমানে সাধারণ রঙ্গ মঞ্চে চলে এসেছে। আস্তে আস্তে এই নৃত্যের রূপের পরিবর্তন হয়েছে। যে নৃত্য এক সময় দেবতাদের তুষ্টির জন্য করা হত তা পরিণত হয় বিলাসের সামগ্রীতে। কথক নৃত্য মন্দির হতে রাজদরবারে স্থান পেয়েছিল মোগল যুগে। যে নৃত্যের মূলভাব ছিল ভক্তিরসের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার আরাধনা তা মুসলিম যুগে এসে পরিণত হয় জনগণের মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসাবে। মোগল যুগে এসে মন্দিরের দেবদাসীরা পরিণত হয়েছিল বাঈজী হিসাবে এবং দেবদাসরা নিযুক্ত হয়েছিল শিক্ষক রূপে। সেই সময় কথক নৃত্য তার উচ্চ আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হয়েছিল। আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল পেশাদার নর্তকী সম্প্রদায়ের। তারা শুধুমাত্র সম্রাট ও উচ্চ বংশীয়দের মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্য পরিবেশন করতেন।

তবে মোগল যুগের পরবর্তী নবাব সংগীত শিল্পীদের খুবই সম্মান প্রদান করতেন এবং তার উৎসাহে এই নৃত্যের প্রচার ব্যাপকভাবে হয়েছিল। আমাদের লোকশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে কথকতার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ভারতবর্ষে। যে কথক নৃত্য আজ আমরা দেখতে পাই তার মধ্যে ইসলামী প্রভাব এবং বৈদেশিক প্রভাব রয়েছে অনেক বেশি। নৃত্যশিল্পীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও আঙ্গিকের পরিভাষাগুলি বিদেশী প্রভাবে প্রভাবান্বিত। যেমন রাধা হল সাকী, আগমন হল আমদ, প্রস্তুত হল অদা, নমস্কারী বা প্রণামী হল সেলামী ইত্যাদি। অতঃপর উভয় সংস্কৃরতির মিলনে কথক নৃত্যশৈলীতে যে রূপান্তর ঘটেছিল তারই প্রতিফলন দেখতে পাই আজকের কথক নৃত্যে। বর্তমান কথক নৃত্যে প্রধানত দুইটি ঘরানার পরিচয় পাওয়া যায়। তারমধ্যে একটি হলো জয়পুর ঘরানা অপরটি হলে লক্ষ্ণৌ ঘরানা। তবে বেনারস ঘরানা বলে আর একটি ঘরানা প্রচলিত আছে। তবে উহার প্রচলন খুবই কম। উহা জয়পুর ঘরানার উত্তরাধিকারীদের দ্বারাই সৃষ্ট। ভৌগোলিক সংস্থানের দিক থেকে কথক নৃত্যের দুটি পীটস্থানের (জয়পুর ও লক্ষনৌ) অবস্থান প্রায় এক অক্ষাংশে। দ্রাঘিমাংশের দূরত্বও খুব কম। উভয় জায়গাতেই মুসলমান এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য বিদ্যমান। তবে অনেকটা পরিমাণগত পার্থক্য রয়েছে। "একই নৃত্যধারা দুটি আলাদা এবং পৃথক নৃত্যশৈলীতে পরিণত হওয়ার মূলে রয়েছে দুটি কারণ : (১) আশেপাশের লোকনৃত্যগুলির প্রভাব। (২) বিভিন্ন শিল্পী-গুরুদের নিজস্ব চিন্তা চেতনা সমৃদ্ধ নৃত্যশৈলীর প্রভাব। সুতরাং জয়পুরী ও লক্ষ্ণৌ এর কথক নৃত্যের মধ্যে যে পার্থক্য তার মূলে যে এই দুটি কারণ বিদ্যমান তা অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে। রাজস্থানের স্থানীয় লোকনৃত্যের আঙ্গিকগত পদ্ধতি যেমন জয়পুরী

কথককে প্রভাবিত করেছে তেমনি রয়েছে স্থানীয় নৃত্যশিল্পীগুরুদের ব্যক্তিগত শৈলী স্বাতন্ত্র। এর থেকেই ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। ঘুমর, গীর, ডাংলীলা, পানিহারী, ঘরোয়ারী প্রভৃতি লোকনৃত্যের প্রভাব রয়েছে জয়পুরী কথক নৃত্যে" (মুখোপাধ্যায়, ২০১৩)।

বর্তমানে একটি জনপ্রিয় নৃত্য হচ্ছে কথক নৃত্য। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট এই নৃত্যের নৃত্যছন্দের ও অন্তর রূপের বার বার পরিবর্তন ঘটেছে। পরবর্তীকালে এ নৃত্যপদ্ধতিতে আরব ও পারসিক সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব দেখা গিয়েছে। দেব-দেবীদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নৃত্যশিল্পীরা যে নৃত্য পরিবেশন করতেন বর্তমানে সেই নৃত্যশিল্পীদের পোষাক ও অলংকারের উপরও ইসলামীয় সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। বর্তমানে মুসলমান শিল্পীরাও রাধাকৃষ্ণ লীলার কাহিনি, রাস রচনা করছেন। মার্গ সংগীতেও একই ধারা লক্ষ করা গিয়েছে। "ধর্মান্ধতা সে সময়েও প্রভাব ছিল। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে ধর্ম ও সংস্কারের গণ্ডী ভেঙ্গে সংস্কৃতিই মানব সমাজে প্রকৃত মিলনের সেতু বন্ধন রচনা করে" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৯)।

কথক শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কথিকা শব্দ থেকে। প্রাচীনকালে বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল যারা দেবতাদের লীলা ও পৌরাণিক উপকথার বর্ণনা করতেন। তারা নৃত্য ও সংগীতের মাধ্যমে তার রূপ দিতেন। কথক বলা হয় তাদেরকেই যারা কথকতা করেন। "সুতরাং নৃত্যের প্রচলন ছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। তখন শুধু দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্যেই নৃত্য শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করতেন। কালক্রমে এটি গ্রাম থেকে মন্দির, মন্দির থেকে রাজসভা আর বর্তমানে সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে চলে এসেছে। আর এখন নাচ অনেকেরই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলিম যুগে এ নৃত্যের আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ে ও নানা বৈচিত্র্য সম্ভারে সমৃদ্ধ কথক নৃত্য বর্তমান কালের অন্যতম জনপ্রিয় নৃত্য শৈলী হিসাবে সমাদৃত" (ঘোষ, ২০১৫)। ঘরানা দুই ধরনের। এক হলো শিল্পীর ব্যক্তিগত শৈলী স্বাতন্ত্র্য। দুই হলো স্থানগত। অর্থাৎ ব্যক্তিক ও স্থানিক। শাস্ত্রীয় নিয়মানুযায়ী নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা নৃত্য শৈলীকে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ করাকেই সাঙ্গীতিক ঘরানা বলে। "ঘরানা কথার দ্বারা একটি বিশেষ নৃত্যের ধারাকে বুঝায়, যা বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীগণ স্বীয় শিল্পকে নিজ নিজ প্রতিভার দ্বারা আবদ্ধ করে রেখেছিলেন যা তাঁর শিষ্যগণ ব্যাতীত অন্য কেহ যেন উহার প্রদর্শন করতে না পারে" (অধিকারী, ২০১৪)।

প্রাচীনকালে যারা গীত, বাদ্য ও নৃত্যের মাধ্যমে দেবদেবীদের লীলাকীর্ত্তন করতেন ও উপাখ্যান ইত্যাদি পাঠ করতেন তারাই কথক, পাঠক ইত্যাদি বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। এই নৃত্যশৈলীর নাম কথক নৃত্য হয়েছে কারণ এই নৃত্য কথক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রচারিত হতো। ভারতবাসীরা ধর্মপ্রাণ ছিলেন চিরকাল ধরেই। তাই এদেশের সংগীত সংস্কৃতিও ধর্মীয় ভিত্তিতেই পরিবেশিত হতো। সুতরাং কথক নৃত্য ও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এখনকার আর সেকালের নৃত্যের মধ্যে কিছু গুণগত তফাৎ বিদ্যমান। বর্তমান নৃত্যের নাম কথক নৃত্য কিন্তু এই কথক নৃত্যের আগের নাম হলো নটবরী নৃত্য। সুতরাং কথক নৃত্যকে আগে বলা হতো নটবরী নৃত্য। এই নটবরী নৃত্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে প্রদর্শিত হতো। সাধারণত দেব-দেবীদের মনের সন্তুষ্টি লাভের জন্যই এই নটবরী নৃত্য পরিবেশিত হতো। দেব-দেবীদের মনে আনন্দ দেওয়ার জন্যই কথক নৃত্য পরিবেশন করত নৃত্যশিল্পীরা। শ্রেষ্ঠ শিল্পী নটবর রূপে কল্পনা করা হতো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। রাধাকৃষ্ণের লীলা মাহাত্ম্য থেকে এই নৃত্যের কাহিনি রচিত হতো। পূজার্চনা ও আরতির পর শুচিতা ও পবিত্রতার সঙ্গে বিগ্রহের সামনে এই নৃত্য প্রদর্শিত হতো বিগ্রহের মনের সন্তুষ্টির জন্য। ধারণা করা হতো এই নৃত্য দেব-দেবীদের সামনে প্রদর্শিত হলে দেব-দেবীরা খুবই খুশি হতেন। বিশুদ্ধতার সঙ্গে কৃষ্ণলীলাকে আজও যাঁরা কথক নৃত্যের দ্বারা রূপদান করেন, তাঁরাই একে নটবরী নৃত্য নামে অভিহিত করেন। এই মুসলিম যুগেই কথক নৃত্যের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কথক নৃত্যের কাহিনি যদিও আজও রাধাকৃষ্ণের লীলাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়, কিন্তু এই নৃত্যের যে পোশাক ও অলংকারাদী তা এখন বিদেশীদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। "যেমন রাধা হলেন 'সাকী', আগমন হল 'আমদ', প্রস্তুত হলো 'অদা', নমস্কারী বা প্রণামী হল 'সেলামী' ইত্যাদি" (মুখোপাধ্যায়, ২০১৩)। মোঘল যুগেই কথক নৃত্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছিল। মহাভারতের যুগে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নটবরী নৃত্য প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রাচীনকালে এই নটবরী নৃত্য দ্বারা দেবতাদের মনের সন্তুষ্টি অর্জন করা হতো আর মোঘল যুগে এই নৃত্যের নাম পরিবর্তন করে কথক নৃত্য নাম দেয়া হয়। মোঘল যুগেই নটবরী নৃত্য কথক নৃত্য নামে প্রচলিত হয়। এতে বলা যায় যে

নটবরী নৃত্য অপেক্ষা কথক নৃত্য বেশ নতুন। কথক নৃত্য অপেক্ষা নটবরী নৃত্য বহু প্রাচীন। নটবরী নৃত্য থেকেই কথক নৃত্যের উৎপত্তি।

ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইসলামী যুগে আনুমানিক ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রচুর সুন্দরী নর্তকীদেরকে ভারতবর্ষে আমদানী করা হত। এসব সুন্দরী নর্তকীদেরকে আমদানী করা হত পারস্য ও খোরোসান থেকে। প্রাচীনকালে যে নৃত্য দেব-দেবীদের মনোরঞ্জনার্থে প্রদর্শিত হতো সময়ের বিবর্তনে সেই কথক নৃত্য সকলের মনোরঞ্জনার্থেই প্রদর্শিত হতো। পারস্য ও খোরোসান থেকে সুন্দর সুন্দর নর্তকীদেরকে টাকা দিয়ে কিনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজসভায় তাদেরকে দিয়ে নৃত্য করানো হতো। এ নৃত্যের মাধ্যমে যশ ও খ্যাতির অধিকারীদেরকে আনন্দ দেয়া হতো। মোট কথা, রাজসভায় উপস্থিত থাকা সকল যশ ও খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনার্থেই এ নৃত্য প্রদর্শিত হতো। এ সব সুন্দরী নৃত্যশিল্পীদের আমদানী করা হতো ভারতবর্ষের এসব খ্যাতিমান ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য। মোগল দরবারে এ কথক নৃত্যের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। একসময় যে নৃত্য প্রধানতঃ দেব-দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য প্রদর্শিত হতো, সেই একই নৃত্য পরিণত হয়েছে বিলাসের সামগ্রীতে। সুতরাং কথক নৃত্য পরিণত হয়েছে বিলাসের সামগ্রীতে। ভোগের সামগ্রীও বলা যায় কথক নৃত্যকে। "ভরতনাট্যম, কথাকলি প্রভৃতি নৃত্য যেমন মুদ্রার সাহায্যে ভাব অভিব্যক্ত হয়, বর্তমান কথক নৃত্যে তেমনি পদাঘাত ও লয়কারীর দ্বারা তা প্রদর্শিত হয়। এতে নৃত্যাংশ বেশি। অবশ্য 'গৎভাও' ও 'অভিনয়' এতে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়নি। এ দুটি প্রদর্শিত হয় রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণনা ও ঠুমরী গানের ভাব ব্যাঞ্জনার সময়। তবলা, মৃদঙ্গ, সারঙ্গী বা হারমোনিয়ামের লহরার সঙ্গেই এই নৃত্য বেশি প্রচলিত" (মুখোপাধ্যায়, ২০১৩)।

বিশেষ করে ইংরেজ আমলের প্রথম থেকেই আর মোঘলশাহীর শেষের পর্ব থেকেই ভারতের বিভিন্নস্থানে নৃত্যশিল্পীরা ছড়িয়ে পরেছিলেন। তাঁদেরই প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী পরবর্তীতে লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ঘরানা নামে পরিচিত হয়। পরে আরও একটি ঘরানার উদ্ভব হয় 'বেনারস' ঘরানা নামে। প্রাচীনকালেই নর্তকী ও নৃত্য সম্প্রদায় ছিল ভারতবর্ষে। এসময় নর্তকীরা শুধু দেব-দেবতাদের সামনেই নৃত্য প্রদর্শন করতেন। কিন্তু মুসলমান আমলে এ নৃত্যের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কথক নৃত্যে এটি খুবই জনপ্রিয় নৃত্য হয়ে উঠেছিল সে সময়ে। তখন মুসলমানদের আমলে এ নৃত্য মন্দির থেকে রাজদরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। রাজদরবারের পাশাপাশি প্রভূত অর্থ ও যশ অর্জনের জন্য এ নৃত্য জনসাধারণের মধ্যেও পরিবেশন করা হতো। মুসলমান সম্রাটগণ নৃত্য ও গীতের প্রতি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান সম্রাটগণ এই নৃত্যগীতের বিলাসিতার দিকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। তারা বিলাস ও মনোবিনোদনের রূপটিকেই প্রধানভাবে দেখতেন। মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক রূপের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না সেই প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতে বিভিন্ন নৃত্য সম্প্রদায় ও নর্তকী ছিল কিন্তু মুসলমান আমলেই প্রথম নাচ ও নাচওয়ালী এই শ্রেণির সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে। তবে এ কথা বলা যায় যে, শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমান সম্রাটদের অবদান অনেক। দরবারে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মুসলমান সম্রাটগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে পারস্য থেকে বিভিন্ন পেশাদারী 'নাচওয়ালী' সম্প্রদায় ভারতে আমদানী করতেন। এসব নাচওয়ালীরা দরবারে উপস্থিত থাকা অর্থ, যশ ও খ্যাতির অধিকারীদের মনোরঞ্জনার্থে নৃত্য প্রদর্শন করতেন। আর রাজদরবারে উপস্থিত থাকা এইসব অর্থ,যশ ও খ্যাতির অধিকারীরা এই নৃত্যকে ভোগবিলাসিতার চোখেই দেখতেন। এ নৃত্যের মাঝে তারা তাদের মনের আনন্দ খুঁজে পেতেন। "প্রধানত : হার্কেনিজ, ডোমনিজ, লোলনিজ ও হেজিনিজ-এর চার সম্প্রদায়ের পেশাদারী নাচওয়ালী ভারতে আসেন নাই। এই নাচওয়ালী সম্প্রদায় কথক নৃত্যের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং পারসিক নৃত্যপদ্ধতির সংমিশ্রণে কথক নৃত্য নতুনরূপ ধারণ করেছিলেন। স্বভাবতই এই পর্যায়ে কথক নৃত্য ভারতীয় নৃত্যের আত্মিক ও দার্শনিক শুদ্ধ ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিছক ইন্দ্রিয় পরায়ণতা ও যৌন আবেদনে পর্যবসিত হয়েছিল এবং নাচওয়ালীরা পেশাদারী গণিকা শিল্পীতে পরিণত হয়েছিল" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৯)।

রাজদরবারের তথাকথিত রাজারা পারস্য ও খোরাসান থেকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সুন্দরী 'নাচওয়ালী'দেরকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসতেন এবং এসব নাচওয়ালীদেরকে বিলাসব্যসনের স্রোতে মগ্ন হয়ে তারা রাজকার্যে অবহেলা করতেন। তাদের নজরে থাকত সবসময় নাচওয়ালীদের উপর তাই তারা রাজাকার্যের দিকে ভালোমতো নজর দিতে

পারতেন না। এছাড়াও এইসব পেশাদারী নর্তকীরা জীবিকা নির্বাহের জন্যও এইসব নৃত্য পরিবেশন করতেন। জীবিকা নির্বাহের জন্য এইসব পেশাদারী নর্তকীরা পথে পথে ঘুরে ঘুরে সাধারণ লোকজনের জন্য নাচ গান করতেন। সাধারণ লোকেরা পেশাদারী নর্তকীদের নাচ-গান শুনে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

"আইন-ই আকবরী" গ্রন্থে নানা ধরনের নটচারণ সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। এছাড়াও আল বাদাওনী রচিত "মুন্তেখব উৎতওয়ারীখ" গ্রন্থেও সংগীত ও কথক নৃত্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। নৃত্যগীতে সুলতান মাহমুদ বেশ পারদর্শী ও একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং তানসেন। তানসেনও ছিলেন নৃত্যগীতে বেশ উৎসাহী ও দক্ষ শিল্পীদের মধ্যে একজন। মুসলমান আমলেইএসব নাচওয়ালী সম্প্রদায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। শুধু মুসলমান দরবারেই নয় হিন্দুশাসকদের দরবারেও তথাকথিত এইসব নাচওয়ালী সম্প্রদায়ের সমাদর ও প্রভাব ছিল ব্যাপক। পরবর্তীতে এইসব নাচওয়ালী সম্প্রদায় বিভিন্ন জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম নিয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ছিলেন। এইসব নাচওয়ালী সম্প্রদায় বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন মানুষের মনোরঞ্জনার্থে নৃত্য পরিবেশন করতেন। তাহারা শুধু রাজদরবারের রাজাদেরই নয় সাধারণ মানুষের মনেও ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিলেন। যে কথক নৃত্য দেবতাদের মনোরঞ্জণার্থে পরিবেশিত হতো সেই কথক নৃত্য এখন ক্ষুদ্র রাজকর্মচারীদেরও মনোবিনোদনের উপকরণ হয়েছে। নাচ ও গীতের প্রতি সবাই এতই আকৃষ্ট হয় যে ক্ষুদ্র রাজারাও তাদের মনোবিনোদনের জন্য নাচওয়ালী রাখতেন। "মন্দির ও ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ থেকে দরবার ও প্রমোদবিলাসের উপকরণে পরিণত হওয়া এই পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই মানব মনের মহৎ আনন্দের উপকরণ কথিকা শ্রয়ী কথক নৃত্য দেহ-সর্বস্ব লীলা বিলাসের উপকরণ হয়ে উঠে" (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৯)।

কথক নৃত্য ছিল দেবতাদের আরাধনার প্রধান অংশ। পরবর্তীকালে এ কথক নৃত্য হিন্দুরাজা ও মুসলমান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ এই তিনটি কেন্দ্রে প্রধান শিল্পকলারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেসব নৃত্যশিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েছিল তাদেরই প্রবর্তিত নৃত্যশৈলী পরবর্তীকালে প্রধানতঃ লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুর ঘরানা নামে পরিচিত হয়েছিল। পরে আরও একটি ঘরানার উদ্ভব হয়েছিল বেনারস ঘরানা নামে। এই তিনটি ঘরানা সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল। বর্তমানে লক্ষ্ণৌ ঘরানাই কথক নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব লাভ করেছে। এই লক্ষ্ণৌ ঘরানার সৃষ্টি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই। এলাহাবাদের নৃত্য সাধক ঈশ্বরী প্রসাদের শিষ্য নৃত্যচার্য ঠাকুর প্রসাদ এই লক্ষ্ণৌ ঘরানা সূচনা করেন। এই ঘরানার আদিগুরু ছিলেন ঈশ্বরী প্রসাদ। ঈশ্বরী প্রসাদ এলাহাবাদের হুনডিয়া তহশিলের বাসিন্দা ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ ছিলেন পরম কৃষ্ণ ভক্ত। এরপর কথা প্রচলিত আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নাকি নটবরী নৃত্যের দুর্দশা দেখে ঈশ্বরী প্রসাদকে স্বপ্নাদেশ দেন তার পুনরুদ্ধারের জন্য। ঈশ্বরী প্রসাদের ছিল তিন পুত্র সন্তান। তাঁর তিন পুত্রের নাম ছিল অড়গু, খড়গু ও তুলোরাম। তাঁর তিন পুত্র সম্মানকেই তিনি উত্তম নৃত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর তিন পুত্র অড়গু, খড়গু ও তুলোরাম নৃত্য শিল্পে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠে ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরী প্রসাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র অড়গুই শুধু নৃত্যচর্চা বহাল রেখেছিলেন। আর অন্য দুই ভাই খড়গু ও তুলোরাম পিতৃশোকে এই নৃত্য চর্চা ত্যাগ করেছিলেন। অড়গুজীরও ছিল তিন পুত্র। তার তিন পুত্রের নাম ছিল প্রকাশ, দয়াল ও হরিলাল। অড়গুজীও তার তিন পুত্রকে যথাযোগ্য নৃত্য শিক্ষার দ্বারা বেশ পারদর্শী করে তুলে ছিলেন। অড়গুজির মৃত্যুর পর তার বড় পুত্র প্রকাশ ভাইদের নিয়ে লক্ষ্ণৌতে চলে যান। লক্ষ্ণৌর নবাব ছিলেন তখন আসফউদ্দৌলা। প্রকাশ নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে নৃত্যশিল্পী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রকাশজীরও ছিলেন তিন পুত্র। তার পুত্র দের নাম হল দূর্গাপ্রসাদ, ঠাকুর প্রসাদ ও মানসিংহ। ঠাকুর প্রসাদ কথক নৃত্যের বেশ উন্নতি সাধন করেছিলেন। কথক নৃত্যের উন্নতি সাধনে ঠাকুর প্রসাদের অবদান অনস্বীকার্য। তাই সমস্ত নৃত্যবিদরাই ঠাকুর প্রসাদকে সবসময় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। ঠাকুর প্রসাদ কথক নৃত্যের নতুন নামকরণ করেছিলেন নটবরী নৃত্য নামে। এমন একজনও নেই যারা কিনা নৃত্যের খোঁজ-খবর অথচ বিন্দা দিন, মহারাজ কালিকা তথা ভৈরো প্রসাদের নাম জানেন না। এরা তিনজনই দূর্গাপ্রসাদের যোগ্য পুত্র ছিলেন। ঈশ্বরী প্রসাদ থেকে দূর্গাপ্রসাদ পর্যন্ত সকলেরই তিন জন পুত্র সন্তান ছিল। "লক্ষ্ণৌ ঘরানার" উৎপত্তি হয়েছিল সেই আচার্য্য ঈশ্বরী প্রসাদের সময় থেকেই। আবার কালিকা প্রসাদেরও তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। তার পুত্রদের নাম হল আচ্ছন, লচ্ছু ও শম্ভু মহারাজ। শুধু অচ্ছন মহারাজেরই তিনজন কন্যা সন্তান ও একজন

পুত্র সন্তান ছিল। অচ্ছন মহারাজের তিন পুত্রের মধ্যে একজন ছিল ভারতের জনপ্রিয় নৃত্য শিল্পী বিরজু মহারাজ। বিরজু মহারাজ বর্তমানে তার সুনিপুণ নৃত্যের মাধ্যমে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

লক্ষ্ণৌ ঘরানার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ভাবপ্রধান নৃত্য, নৃত্যাংশে তোড়া ও টুকরার সমাবেশ, নৃত্যের বোলগুলি ছোট ও শ্রুতিমধুর, ভজন, ঠুমরী, কবিতা প্রভৃতির প্রয়োগ এবং ভাবাভিনয়ের সঙ্গে তাল ও ছন্দের সামঞ্জস্য বিধান। প্রায় দেড়শো বছর আগে ভানুজী জয়পুর ঘরানার গোড়া পত্তন করেছিলেন। ভানুজী ছিলেন শিবভক্ত। তিনি জনৈক শৈব সন্ন্যাসীর কাছ থেকে নিপুণভাবে শিবতাণ্ডব নৃত্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ ভানুজী ছিলেন জয়পুর ঘরানা প্রবর্তক। ভানুজীর ছিলেন একটিমাত্র পুত্র সন্তান। ভানুজীর পুত্রের নাম হল মালুজী। ভানুজী তার পুত্র মালুজীকেও শিবতাণ্ডব নৃত্যে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। মালুজীরও ছিল দুই পুত্র। একজন হল লালুজী এবং আরেকজন হল কানুজী। লালুজী ও কানুজী তাদের পিতা মালুজীর কাছ থেকে শিবতাণ্ডব নৃত্যে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং তারা দুই ভাইও একসময় এই নৃত্যে বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। লালুজী ও কানুজী এই দুই ভাইয়ের মধ্যে কানুজী ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। পরে কৃষ্ণভক্ত কানুজী বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন এবং বৃন্দাবনে গিয়ে তিনি একটি লাস্যভাবযুক্ত "রাধাকৃষ্ণলীলা" রচনা করেছিলেন। কানুজীরও ছিল দুই জন পুত্র সন্তান। একজন হল গিরিধারীজী ও আরেক জন হল শোজাজী। গিরিধারীজী ও শোজাজীও পিতার কাছ থেকে নৃত্য শিক্ষা নিয়ে এই নৃত্যধারায় বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। গিরিধারীজীর ছিল পাঁচ পুত্র। গিরিধারীজীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে এক পুত্র দুলহজী জয়পুর ঘরানাকে আরও অনেক সমৃদ্ধতর ও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। দুলহজীর অকৃত্রিম পরিশ্রমের ফলেই জয়পুর ঘরানা আজ এতো সমৃদ্ধতর ও জনপ্রিয় হয়েছে। গিরিধারীজীর আর এক কৃতি পুত্র ছিলেন হনুমান প্রসাদজী। হনুমান প্রসাদজীর ছিল তিন পুত্র। তার পুত্রদের নাম হল মেনাহলাল, চিরঞ্জীলাল এবং নারায়ণ প্রসাদ। গিরিধারীজীর পুত্রদের মধ্যে আর একজন হলেন হরিপ্রসাদ। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। হরিপ্রসাদ নিঃসন্তান হলেও কথক নৃত্যে বেশ নিপুণ ছিলেন। "জয়পুর ঘরানায় তাণ্ডব নৃত্যের প্রভাব ছিল খুব বেশি। এই ঘরানার নৃত্যে সঙ্গত করিবার জন্য তবলা ও পাখোযাজের বোল অত্যাবশ্যকীয়। জয়পুরী ঘরানার তাল ও লয়ের কাজ খুবই কঠিন কিন্তু ভাব ও লাস্যের একান্ত অভাব ছিল এই নৃত্যে। বর্তমানে কিছু কিছু গৎ ভাও এই নৃত্যে দেখা যায়। বর্তমানে এই ঘরানার প্রতিনিধিদের মধ্যে জয়কুমারী, রাম গোপাল, কুমুদিয়া লাখিয়া, সুস্মিতা মিশ্র ও রোশন কুমারীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ্য" (অধিকারী, ২০১৪)।

জয়পুর ঘরানার সাথে লক্ষ্ণৌ ঘরানার নৃত্যের মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। কিন্তু এটা বলা যায় যে গুনগত বিচারে ও উৎকর্ষের দিকে থেকে জয়পুর ঘরানার চেয়ে লক্ষ্ণৌ ঘরানাই অনেক সমৃদ্ধ। জয়পুর ঘরানার একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল লক্ষ্ণৌ ঘরানার বোল অপেক্ষা বড় জয়পুর ঘরানার বোল। জয়পুর ঘরানা ছিল দুইভাবে বিভক্ত। যথা জয়পুর ও জানকী প্রসাদ প্রবর্তিত ঘরানা। জয়পুর ঘরানা রাজস্থানের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় বেশ প্রচার ও প্রসার লাভ করে। জয়পুর ঘরানায় জটিল তালগুচ্ছের দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হতো। ফলে জয়পুর ঘরানার সৃজনশীল নতুন রূপকর্মের গতি ধীরে ধীরে বাঁধাগ্রস্থ হতে থাকে। এই কারণে জয়পুর ঘরানার অনেক শিল্পী লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠে। জয়পুর ঘরানার শিল্পীদের মধ্যে অসংযত জীবনযাত্রা ও মাদকদ্রব্য আসক্তির ফলে এই ঘরানা বর্তমানে বিলুপ্তির পথে। বেনারস ঘরানা হল জানকী প্রসাদ প্রবর্তিত জয়পুরের একটি শাখা। জানকি প্রসাদের প্রবর্তিত জয়পুরের এই শাখাই বেনারস ঘরানা নামে পরিচিত। লক্ষ্ণৌ ঘরানার সাথে বেনারস ঘরানার তেমন কোন পার্থক্য নেই। জয়পুর ঘরানার পূর্বে রাজস্থানে একটি পৃথক ঘরানার উদ্ভব হয়েছিল। সেই পৃথক ঘরানাটিই "শ্যামলদাস" ঘরানা নামে প্রচলিত হয়। এই শ্যামলদাস ঘরানা আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি হল জয়পুর ঘরানা আর অন্যটি বেনারস ঘরানা। শ্যামলদাসের ঘরানাই জয়পুর এবং বেনারস ঘরানা নামে প্রসিদ্ধ অর্জন করেছিল। জানকী প্রসাদের ছিল দুই ভাই। একজন হল চুনীলাল এবং আরেকজন হলো দুলহারাম। দুই ভাইয়ের মধ্যে দুলহারাম বেনারসে বসবাস করতে থাকেন আর চুনীলাল রাজস্থানে চলে গিয়েছিলেন। দুলহারামের ছিল তিন পুত্র। তার পুত্রদের নাম হল বিহারীলাল, পূরণলাল এবং হীরালাল। তাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে হীরালাল আর বিহারীলাল ছিলেন নৃত্যে পারদর্শী। কিন্তু হীরালালের চেয়ে বিহারীলাল নৃত্যে প্রচুর যশ অর্জন করেছিলেন। বিহারীলালের নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিযুক্ত করা হয়েছিল ইন্দের দরবারে। বিহারীলালের ছিল তিন পুত্র। তার তিন পুত্র হল কিশানলাল, মোহনলাল এবং

সোহনলাল। কালক্রমে বিহারীলালের পুত্ররা দেরাদুনে চলে গিয়েছিলেন। পুরানলালের ছিল দুই পুত্র সন্তান। তাঁর পুত্ররা হলেন মদনলাল এবং রামলাল। পুরানলালের দুই পুত্রই পাতিয়ালাতে বসবাস করতেন। জানকী প্রসাদের ভাই গণেশীলালের ছিল তিন পুত্র। তাঁর পুত্ররা হল হনুমান প্রসাদ, শিবলাল এবং গোপালদাস। তারা তিন ভাই'ই নৃত্যে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে শিবলাল ছিলেন তবলা বাজানোর মধ্যে অনেক পারদর্শী। শিবলালের তবলার প্রতিমধুরে বোল সবাইকে মুগ্ধ করত। আবার শিবলালের ছিল তিন পুত্র। শিবলালের পুত্ররা হলেন সুখদেব, দূর্গাপ্রসাদ এবং কুন্দনলাল।

তিন ভাইয়ের মধ্যে সুখদেব ও দূর্গাপ্রসাদ নৃত্য চর্চা করেননি কিন্তু শিবলালের আরেক পুত্র কুন্দনলাল নৃত্যে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। গণেশীলালের ছিল তিন পুত্র। গণেশীলালের পুত্রদের মধ্যে তৃতীয় পুত্র গোপালদাস বাস করতেন লাহোরে এবং তিনি পাতিয়ালার সভানর্তক পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আধুনিককালে গোপীকিষান এই বেনারস ঘরানার ধারক ও বাহক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ ঘরানার মতো ভাবাভিনয় এবং তাল ও ছন্দের সংমিশ্রনের উপর বেনারস ঘরানার সৌন্দর্য নির্ভরশীল। "জয়পুর কিংবা লক্ষ্ণৌ ঘরানা থেকে বেনারস ঘরানার মুদ্রাদির প্রয়োগবিধি স্বতন্ত্র্য। তাছাড়া বেনারস ঘরানার নৃত্যে কেবলমাত্র বোলই প্রযুক্ত করা হয়, অন্যান্য ঘরানার মত তবলা বা পাখোয়াজের বোল ব্যবহৃত হয় না" (ঘোষ, ২০১৫)।

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীতে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। পরিবেশ, সমাজ ও মানুষের যেমন পরিবর্তন হয় তেমনি যুগেরও পরিবর্তন হয়। যুগের যেমন পরিবর্তন হয় তার সাথে সাথে মানুষের অভ্যাস, কাজকর্ম, পোশাক, পরিচ্ছন্নতারও পরিবর্তন হয়। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কথক নৃত্যের আঙ্গিকেও এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তনই পৃথিবীর নিয়ম। যুগভেদে ও রুচিভেদে যেমন কথক নৃত্যের পরিবর্তন হয়েছে তেমনি পরিবর্তন হয়েছে এর বেশভূষারও। এই কথক নৃত্যের বেশভূষার উপর মুসলিমদের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বহুকাল আগে থেকেই। কথক নৃত্যের বেশ-ভূষা ইসলামীয় প্রভাবযুক্ত ছিল। কথক নৃত্যশিল্পীদের রাজাশ্রয় দেওয়া হইত মোগল আমলে। এর ফলে বেশ ভূষা ও নৃত্যের ভাবে দেখা যেত ইসলামীয়দের প্রভাব। এই প্রভাব এখনও পর্যন্ত বর্তমান আছে। পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা পড়তেন চুড়িদার, বারাবন্দী পাজামা এবং ঘেরদার জামা। ঘেরদার জামার উপরে আবার শেরওয়ানীও পড়তেন। জামার উপরে কেউ কেউ আবার খোলা গলার ওয়েস্ট-কোর্ট পড়তেন। মাথায় পড়তেন জরীর টুপি। তার অনুরূপ পোশাক পড়তেন নারী শিল্পীরাও। নারী শিল্পীরা আবার কখনও কখনও শাড়ি ব্লাউজও পড়তেন। শাড়ি পড়ার ধরনটা হতো বাংলাদেশের নারীদের মত। বাংলাদেশের নারীরা যে ভাবে শাড়ী পড়তেন নারী নৃত্যশিল্পীরাও সেভাবে শাড়ী পড়তেন। পুরুষ নৃত্যশিল্পীরা আবার কখনও কখনও অন্য আর এক প্রকার পোশাকও ব্যবহার করতেন। সেই পোশাকটা ছিল সাদা ধুতি তারা সাথে উর্দ্ধাঙ্গ নিবারণ থাকত এবং কাঁধের উপর দিয়া একটি দোপাট্টা দেওয়া থাকত। মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এই পোশাকটির খুব প্রচলন ছিল। "মুসলিমদের রাজত্বের পূর্বে কথক নৃত্যের এইরকম বেশ-ভূষা বিশেষ বিশেষ দেববেবীর অনুসারে হতো, যেমন – কৃষ্ণ চরিত্রে রেশমী পীতাম্বর, কর্ণে মরুচির কুন্ডল শিরে ময়ূর পঙ্খের মুকুট ইত্যাদি পরিধান করা হত" (ঘোষ, ২০১৫)। কিন্তু কথক নৃত্যের এই বেশ-ভূষার বিবর্তন ঘটেছিল মুসলিম যুগে। মুসলিমরাই কথক নৃত্যের পোশাক হয়েছিল গোড়ালী পর্যন্ত লম্বা স্বচ্ছ জামা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং সেই সাথে এই সিল্কের জামার উপর ওড়না, জ্যাকেট ও টুপি ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে লাগে। কথক নৃত্যের বেশ-ভূষার মধ্যে সালোয়ার ও চুড়ীদার পায়জামাগুলো কে বেশ গণ্য করা হতো। জয়পুর ঘরানার নিত্য শিল্পীদের মধ্যে মেয়েরা ছোট ব্লাউজ, ঘাঘরা ও ওড়না পায়জামার সাথে ব্যবহার করতো। তাছাড়া নারী নৃত্যশিল্পীরা পোশাকের সাথে সাথে নানা রকমের অলংকার পড়ে নিজেদেরকে আরও সুসজ্জিত করে তুলতো। অলংকার নারীনৃত্য শিল্পীদের সৌন্দর্য আরো বাড়িয়ে তুলতো। নারী নৃত্য শিল্পীরা অলংকার হিসেবে ব্যবহার করতেন কণ্ঠহার, বালা, কর্ণভুষণ, টিকলী ইত্যাদি। সেই সাথে মাথার অলংকার হিসেবে ব্যবহার করতেন টিকলীর পাশাপাশি ঝাপটা। তবে বর্তমানে কথক নৃত্য শিল্পীদের কে চুড়ীদার পায়জামার সাথে সাথে শাড়ি পড়তেও দেখা যায়। "যাইহোক বর্তমানে কথক নৃত্যের বেশ-ভূষার যে মুসলিম যুগের প্রভাবই রয়ে গেছে সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে বর্তমান কালের বেশ-ভূষায় পূর্বের চটকত্ব অনেকাংশে পরিহার করা হয়েছে এবং

যথাসম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক বেশ ভূষার প্রতি ঝোঁক দেখা যাচ্ছে" (ঘোষ, ২০১৫)। ভরত তার নাট্য শাস্ত্রে রূপসজ্জার জন্য চারটি রঙের কথা উল্লেখ করেছেন। রঙ গুলো হলো লাল, নীল, হলুদ এবং কালো। নৃত্য শিল্পীরা তাদের চরিত্রের যথাযথ পরিস্ফুটনের জন্য এই চারটি রঙের থেকে যে কোন রঙ ব্যবহার করতে পারতেন যেমন- কণ্ঠে তাহারাবালী, কর্ণে কর্ণভুষন, নয়নে অঞ্জনরেখা ইত্যাদি ভাবে শিল্পীরা নিজেদেরকে সাজাতে পারতেন। প্রাচীনকালে যেমন শিল্পীরা লাল, নীল, হলুদ, কালো নানারকমের রঙ্গ দিয়ে সজ্জিত হতেন আর আধুনিক কালের শিল্পীরা তাদের রূপসজ্জার জন্য স্নো, পাউডার, ক্রীম, নেলপালিশ ইত্যাদি নানা রকমের উন্নত প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করছেন। তাই বলা যায় যে যুগভেদে ও রুচিভেদে কথক নৃত্যের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে কথক নৃত্যের শিল্পীদের বেশ-ভূষা ও রূপসজ্জারও।

কথক নৃত্য প্রদর্শনের একটা রীতি প্রচলিত আছে। প্রথমে মঞ্চে লহরা বাজানো শুরু হয়। পরে তবলা বাদক এক চক্রদার পরন বাজায়, তারপরেই নৃত্যশিল্পীরা মঞ্চে প্রবেশ করে। কথক নৃত্যে সর্বপ্রথম নিকাশ ও আমদ দেখানো হয়। তারপর শিল্পীরা বিভিন্ন ভাব ও মুদ্রা প্রদর্শন করেন। সেই সময় তবলার সাদারণ ঠেকা বাজানো হয় এবং প্রয়োজন শিল্পীর সাথে অথবা পৃথকভাবে ছোট ছোট মোহর দিয়ে "সম"এ আসে তবলা বাদক। তারপর শিল্পী সেলামী বা নমস্কার প্রদর্শন করেন। মোগল আমলে নৃত্যের শুরুর দিকে নবাব বা রাজাকে নৃত্যের মাধ্যমে সম্ভাষন জানানোর রীতি ছিল যাহা সেলামী বা নমস্কার নামে পরিচিত। কিন্তু এখন আর সেই সেলামী বা নমস্কার কোন শিল্পী প্রদর্শন করেন না। কেহ কেহ সাধারণ দর্শকদের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য কিছু তৎকার দেখান। কিন্তু এই তৎকার সাধারণত নৃত্যের একেবারে শেষে দেখানো হয়। শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুযায়ী ইহাই সঠিক নিয়ম। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী সেলামীর পরে জোড়া, পরন ও তিহাই দেখানো হয়। বিভিন্ন সময়ে এগুলো ছাড়াও জোড়াতে অঙ্গ সঞ্চালন এবং পায়ে বোল দেখানো হয়ে থাকে। তারপর নৃত্য শিল্পী নিজে অথবা তবলা বাদক হিন্দী ভাষায় রচিত ছোট ছোট বোল তালে তালে মুখে বলেন। এরই মাধ্যমে নৃত্যের সাহায্যে ভাব প্রদর্শন করা হতো। তবলা বাদক এক সময় ছোট ছোট টুকরো দেখাইয়া সম-এ আসতেন। কোন কোন সময় লয় দ্রুত করে তৎকার দেখানো হতো। সবশেষে শিল্পী নিজেই তিহাই দিয়ে নৃত্য সমাপ্ত করতেন।

বাংলাদেশে কথক নৃত্যের ইতিহাস : বর্তমানে বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় শিল্পকলা হলো নৃত্যকলা। তবে এই নৃত্যকলার বর্তমান যে অবস্থান সেখান আসতে অনেক বাধা-বিপত্তি পার করতে হয়েছে। এই নৃত্যকলাকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে শিল্পীদের নানান চড়াই উৎরাই পার করতে হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বে নৃত্যকলা পূর্ব পাকিস্তানে অনেক অবহেলিত ছিল এবং শিল্পীদের চলার পথ একেবারেই মসৃণ ছিল না। আমরা ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, সবসময় বিদেশী শাসকরা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলাদেশের নীরিহ জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এর কারণে কখনই বাংলাদেশে শুদ্ধ ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে ওঠেনি। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে দুটি দেশের সৃষ্টি হয়েছিল : একটি হলো ভারতবর্ষ আর অপরটি হলো পাকিস্তান। আবার বঙ্গপ্রদেশ দুটি ভাগে ভাগ হয়েছিল। একটি ভাগের নাম হলো পূর্ব পাকিস্তান যা বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত আর অপর ভাগটির নাম হলো পশ্চিমবঙ্গ যা ভারতের অন্তর্ভূক্ত। ভারত স্বাধীন হয়ে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে সুযোগ পায়নি এবং তাঁরা দারুণ বৈষম্যের শিকারের সম্মুখীন হয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণ আত্মমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ায় এই বৈষম্য মেনে নিতে পারেনি। রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আর এই স্বাধীনতা অর্জনের পর আজ বাংলার শিল্পী, কবি, বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিকদের ভাবনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার সাথে সাথে উন্মুক্ত হয়েছে চিন্তার দ্বার বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই এদেশের সংস্কৃতি প্রেমী মানুষেরা ধীরে ধীরে পার্শ্ববর্তী দেশ গুলির সাথে বন্ধু সম্পন্ন সম্পর্ক গড়ে তোলে যার ফলে আমাদের সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। বাংলাদেশে কথক নৃত্যের উৎস সন্ধানে গবেষণা করতে গিয়ে আমরা একটি বিষয়ে সুনিশ্চিত হই যে, কথক নৃত্য কখনই বাংলাদেশের ছিল না। এটি ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের একটি নৃত্য। তবে বাংলাদেশে এর প্রচলন কিভাবে, কবে থেকে আসে এবং বর্তমানে তা কিভাবে এত জনপ্রিয় হয় তা অনুধাবন করতে আমাদের অনেক বিস্তারিত আলোচনা

করতে হয়। কেননা এই জনপ্রিয় কথক নৃত্য সরাসরি একদিনে আসেনি। মূলত ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এই বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জগতের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারত তথা কলকাতা। বাংলায় মুসলমান সমাজ সংখ্যাগরিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষা ও আর্থসামাজিক পশ্চাৎ পদতার কারণে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তেমন কোন ভূমিকাই ছিল না এবং মুসলমান সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের অধিবাসী হয়ে উঠেছিলেন। এই অচলায়তন ভেঙ্গে কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু, মুসলমান সকলের মধ্যে জাতীয়তা ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ধীরে ধীরে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হতে থাকে মুসলমান তরুণরা, তবে নৃত্যকলাকে সহজ ভাবে মেনে বা মানিয়ে নিবার মত মনোভাব তখনও মুসলমানদের মাঝে গড়ে ওঠেনি। ঠিক সেই সময় মুসলমানদের গোড়ামী ভেঙ্গে দিয়ে নৃত্যকলাকে উৎসাহিত ও সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে যিনি কাজ শুরু করেছিলেন তিনি হলেন 'বুলবুল' চৌধুরী। তিনি ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারী বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন আজমুলাহ্ চৌধুরী এবং মাতা মাহ্ফুজা চৌধুরী। তাঁর পিতা পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। বুলবুল চৌধুরীর মাতা-পিতার দেয়া নাম ছিল রশীদ আহমদ চৈধুরী তিনি ছোট বেলা থেকেই ছবি আঁকা, কবিতা লেখা ও গান করার জন্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৩৪ সালে মানিকগঞ্জ হাই স্কুলের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিজের উদ্ভাবিত ভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশ করেছিলেন এবং এই নৃত্যের নাম দিয়েছিলেন চাতক নৃত্য। এই একই সালে তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং কলেজের এক অনুষ্ঠানে রশিদ আহমদ চৌধুরী প্রথম 'বুলবুল চৌধুরী' নামে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি একজন সচেতন শিল্পী ছিলেন। তিনি ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ, কালো বাজারী ও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের পটভূমিতে রচনা করেন বিখ্যাত নৃত্যনাট্য "লেস্ট উই ফরগেট"। এই নৃত্য কর্ম নিয়ে কলকাতার সমস্ত দৈনিক পত্রিকা গুলির প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। নৃত্যশিল্পী সাধনা বসুর সহ শিল্পী হিসাবে তিনি নৃত্য পরিবেশন করেন 'কচ ও দেবযানী' ও 'মেঘদূত ও স্ট্রীট হাঙ্গর' – এইসব নৃত্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে হেমলতা মিত্রের বিশেষ অবদান ছিল। তিনি কলকাতা কালচারাল সেন্টার এবং ওরিয়েন্টাল ফাইন আর্টস এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন আনুমানিক ১৯৩৫-৩৬ সালে। তিনি এই কালচারাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় বিভিন্ন নৃত্যের সংমিশ্রণে নতুন এক নৃত্যের রূপদান করেছিলেন।

ঢাকায় দেশ বিভাগের পর ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর গওহর জামিল বন্ধু রবি শঙ্কর চ্যাটার্জিকে সাথে নিয়ে ১৯৪৮ সালে 'শিল্প কলা' ভবন তৈরি করেন। এই ভবনের মাধ্যমে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক নৃত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ঢাকার নৃত্যাঙ্গনে কেষ্টপাল নামে একজন স্বনামধন্য নৃত্য শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যে টলি রায় পালটি, মঞ্জু খাসনবীশ, রুনু ভৌমিক, মঞ্জু ভৌমিক, নার্গিস মুর্শিদা ও সেলিনা বাহার এদেশের সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৯ সালে গওহর জামিল এদেশে প্রথম নৃত্যনাট্য ইন্দ্রের সভা পরিচালনা করেন। এই নৃত্য নাট্যের মূল চরিত্রের নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন গওহর জামিল ও তার বোন শীপ্রা নাথ। সেই সময়ে অনেক গুনীশিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৃত্যনাট্য তৈরি হলেও এখনকার মতো কোন শাস্ত্রীয় নৃত্যধীরার প্রচলন ছিল না।

একুশে পদক প্রাপ্ত নৃত্য গুরু আমানুল হোক করাচীতেই ওস্তাদ আমিন উদ্দিন কথকির নিকট লক্ষ্ণৌ ঘরানার বিশুদ্ধ কথকের তালিম নেন। সেটা ছিল ১৯৬৬ সালের আগের কথা। তখন বাঙালীদের বেশ কটি সাংস্কৃতিক সংস্থা ছিল করাচীতে। যেমন নজরুল একাডেমী, পূরবী মহফিল, করাচী কালচারাল সেন্টার, ইষ্ট পাকিস্তান এসোসিয়েশন। সেই তালিমের সূত্র ধরে আমানুল হক সেই সময় বিভিন্ন খ্যাতনামা নৃত্যনাট্য তৈরি করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে নুরুল হুদার উদ্যোগে ঢাকার ওয়াইজ ঘাটে বুলবুল ললিত কলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে এই দেশের মানুষ শিল্পকলা চর্চা করার জন্য প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশ পেয়েছিলেন। ষাট এর দশকের শুরুর দিকে এদেশে অনেকে যেমন নিকুঞ্জ বিহারী পাল, জিনাৎ জাহান, প্রহ্লাদ দাস, কার্তিক সেন, অজিত সান্যাল সহ আরও অনেকেই নৃত্য শিক্ষাদান করতেন। কার্তিক সেন জাতিগত ভাবে মনিপুরী ছিলেন। কিন্তু তিনি কথক শিখাতেন। তিনি মিশ্র ঘরানার নৃত্য পরিবেশন করতেন তবে জয়পুর ঘরানার বেশি নৃত্য পরিবেশন করতেন।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথক নৃত্যশিল্পী আবুল কালাম আজাদ তার বাবার সাথে মিউজিক কলেজে যেতেন এবং সেখানে তিনি প্রথমে গান শিখা শুরু করেছিলেন। গানের সাথে সাথে ঐ মিউজিক কলেজের ছেলেরা যে নাচ শিখতেন

তা দেখতে উনার খুব ভাল লাগত। তবে তিনি লোকনৃত্য দেখে খুব বেশি আনন্দ পেতেন না। তাঁর কাছে কথক নৃত্য খুবই ভাল লাগত। তাঁর একবার সৌভাগ্য হয়েছিল দেবী রানী ও অনুরাধা গুহের কথক নৃত্য দেখার। আর সেই থেকেই উনার কথক নৃত্য ভাল লাগা। মঞ্জুরুল হোসেন খাঁ সাহেবের কাছে তিনি নৃত্য শিখতেন। সেই সময় ওস্তাদ বাড়িতে এসে উনাকে নৃত্যের তালিম দিতেন।

আর এটা সম্ভব হয়েছিল যেহেতু তিনি একজন সংগীত পরিবারের ছেলে ছিলেন। তাঁর পিতা খুবই সংগীত প্রেমী মানুষ ছিলেন এবং তিনি শিক্ষক ও শিল্পীদের ভীষন যত্ন সহকারের আদর আপ্যায়ন করতেন। আর ওস্তাদরাও আনন্দের সাথে নৃত্য শিক্ষাদান করতেন। শিল্পী আবুল কালাম আজাদ এর অনেক নৃত্য শিষ্য ছিল, তার মধ্যে একজন শিলা মমতাজ যিনি সুদূর আমেরিকার টেক্সাসে আবুল কালাম আজাদ নামে একটি নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিস্থাপন করেন। তাঁর আরেকজন নৃত্য শিষ্য বর্তমানে খ্যাতিমান কথক নৃত্য শিল্পী মুনমুন আহমেদ।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বন্ধুত্ব পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠে। এর ফলে সেই সময়কার নৃত্য শিল্পীরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় নৃত্য সম্পর্কে জানতে শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে কথক নৃত্য শিল্পী জিনাত জাহান নৃত্য শিক্ষক হিসাবে যোগদেন ছায়ানটে। তিনি নৃত্যকলায় স্নাতক করেছিলেন কলকাতার বজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় থেকে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট নৃত্য শিল্পী সাজু আহমেদ কথক নৃত্য গ্রহণ করেছিলেন তাঁর কাছ থেকে। পরবর্তীতে উনি ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে কথক নৃত্যের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

এইভাবে ধীরে ধীরে শিবলী মাহামুদ, মুনমুন আহমেদ, তাবাস্‌সুম আহমেদ, কচি রহমান, কাজী রিপন ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে কথক নৃত্যের উপর উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন। এইসকল স্বনামধন্য গুণী নৃত্যশিল্পীরাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কথক নৃত্যকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায় কথক নৃত্য ভাববাহী নৃত্য (পাদকর্ম ও অঙ্গ চালনা প্রধান) যার মধ্যে নাট্য (নাটকীয়তা ও কাহিনি) এবং ভাব রস শিল্পকর্ম সব কিছুই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই নৃত্যের ভাবরস ব্যঞ্জনা দুঃসাধ্য ও মুষ্টিমেয় রসিক মানুষের বোধগম্য বলে নিছক বাহবা অর্জনের আশায় নৃত্য শিল্পীগণ স্বীয়আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু পায়ের দ্রুত লয়ের কাজ ও ছন্দবোলের লড়াই দেখিয়ে চটুল চাহনি ও লঘু ভঙ্গিমায় কথককে বর্তমানে স্বল্পপ্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীরা স্থূল ও চটুল প্রমোদ ধর্মীয় নৃত্যে পর্যবসিত করেছেন। অবশ্য অশার কথা এই যে, সাম্প্রতিককালে শাস্ত্রীয় রুচিজ্ঞান সম্পন্ন শিল্পীরা এই নৃত্যে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে যথার্থ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। সবশেষে বলা যায় যে, কথক নৃত্যের উৎপত্তি ভারতেই হয়েছিল এবং কালক্রমে তা ধীরে ধীরে বিভিন্ন গুণী শিল্পীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রসার লাভ করে।

গ্রন্থ পঞ্জিকা :

১। রায়, অভিজিত, (১৪১৩ বাং), *কথক নৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা* (২য় সংস্করণ)। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
২। রাহমান, সুলতানা, (১৯৮৪), *বুলবুল চৌধুরী* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ঢাকা : বাংলা একাডেমী।
৩। চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, (১৯৮৯), *ভারতের নৃত্যকলা* (চতুর্থ সংস্কণ), কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন।
৪। ঘোষ, চৈতালী, (২০১১), *ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং ছৌ ও বাংলার লোকনৃত্য* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং।
৫। চক্রবর্তী, মন্দিরা, (২০১১), *ফিরকনী* (দ্বিতীয় সংস্করণ), কলকাতা : দমদম সঙ্গীতম।
৬। রায়, অভিজিত, (১৪১৬ বাং), *কথক নৃত্য-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
৭। অধিকারী, অনুপ শঙ্কর, (২০১৪), *নৃত্য-বিতান* (পঞ্চম সংস্করণ), কোলকাতা : আদি-নাথ ব্রাদার্স।
৮। সিকদার, সুরেন্দ্রনাথ, সিকদার, তরু ও সিনহা, বুলু, (২০০৪), *কথক-নটবরী নৃত্যশাস্ত্র* (নবতম সংস্করণ), উঃ ২৪ পরগণা, খড়দহ : মহামায়া প্রেস।
৯। চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী, (১৯৯৫), *নৃত্য শাস্ত্র* (প্রথম সংস্করণ), কলকাতা : করুণা প্রকাশনী।
১০। মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর লাল, (২০১৩), *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা* (দ্বিতীয় প্রকাশন), কলকাতা।
১১। ঘোষ, শম্ভুনাথ ও ঘোষ, অনিন্দিতা, (২০১৫), *কথক নৃত্যের রূপরেখা* (ষষ্ঠ সংস্করণ), কলকাতা : সঙ্গীত প্রকাশন।